**†kvKven AvM÷ উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ**

**হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে একজন মহান পুরুষ**

ঝর্না রহমান

চির মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীতে দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ, লোভ, হানাহানি, হত্যা, জিঘাংসার উন্মত্ততা দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব; / ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ! এই লোভ আর হিংসার নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব থেকে মানুষকে মানবিক ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি শুভচৈতন্যময় নতুন কোনো মহৎ প্রাণের আবির্ভাব কামনা করে বলেছেন,“নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী/ কর ত্রাণ মহা প্রাণ, আন অমৃতবাণী,/ বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।” বাঙালির জাতীয় জীবনের অন্ধকার দূর করে, এ দেশের শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এমনি একজন মহাপ্রাণ ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছিল। তিনি এদেশের দুঃখকাতর জনগণের ভাগ্যাকাশে এক চিরদেদীপ্যমান সূর্য। তিনি বাংলার স্বাধীনতার স্থপতি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব, বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- বাংলাদেশের মানুষের হাতে যিনি তুলে দিয়েছিলেন পদ্মা-মেঘনা-যমুনার ঠিকানার দলিল-স্বাধীনতা, যিনি এ দেশের মানুষকে আত্মপরিচয়ের শ্লাঘায় উদ্দীপ্ত করে লাল সবুজের পতাকাতলে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন!

এই অর্জন একদিনে সম্ভব হয়নি। সুদীর্ঘকালের বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে দেশের মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা এবং স্বভাষা, স্বসংস্কৃতি ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ক্রমে তাদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা খুব সহজ কাজ ছিল না। দুই শতাব্দীর ইংরেজ শাসন এদেশের সাধারণ মানুষের মর্মমূলে গভীরভাবে ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি প্রোথিত করে দিয়েছিল। বৃটিশ বেনিয়া শাসকদের কুটিল রাষ্ট্রচক্রের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া এদেশের জনগণ ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সব দিক থেকে অবহেলিত, বঞ্চিত, পাশাপাশি ছিল দিকভ্রান্তও। স্বাধিকার চিন্তা, মুক্তি চেতনা, স্বাতন্ত্র্যবোধ সব ছিল ধুলোর আস্তরণে ঢাকা। এই আবরণ সরিয়ে জনমানসে মুক্তির আলোকময় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে দিতে এই অবিসংবাদিত নেতার উত্থান ঘটেছিল। বিশ্বকবি রচিত সেই কবিতার মতোই তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল মানব ত্রাণ, তাঁরও মুখে ছিল অমৃতবাণী। তাঁরও অঙ্গুলি শীর্ষে ছিল এক চূড়ান্ত দিক নির্দেশনা, যে নির্দেশনায় ছিল জাতির উদয় দিগঙ্গন, জনতার শোষণমুক্ত জীবনের ঠিকানা। সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক সর্বব্যাপী আন্দোলন। বাংলার জনগণের কাছে ক্রমে এই নেতা হয়ে উঠেছিলেন মুক্তির দূত। তিনিও একজন মহান কবির মতোই উচ্চারণ করেছিলেন অমর বাণী- “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!” শোষিত মানুষের সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জীবনের ইশতেহার, তাদের হতাশাপূর্ণ চোখে এঁকে দিয়েছিলেন স্বাধীন দেশে নিজের মতো করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন, মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন সুন্দর জীবনের আশা। একাত্তরে তাঁর নেতৃত্ব তাই অনিবার্যভাবে জরুরি হয়ে উঠেছিলো। দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এমন গণজোয়ার সৃষ্টি করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা এবং শত্রুর কারাগারে বন্দি থেকেও হিমালয় প্রতিম দৃঢ় ব্যক্তিত্বশক্তি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে নয়মাসের মধ্যেই দেশ স্বাধীন করার ইতিহাস বিশ্বে আর কোনো নেতা রচনা করতে পারেননি।

একাত্তরে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তার পেছনে যে দীর্ঘকালের আন্দোলন সংগ্রাম আর লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে, তিনি ছিলেন তার একেবারে শুরু থেকেই। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই ভাষা আন্দোলনের এক অগ্রপথিক। ভাষার জন্য লড়াই করে জেল খেটেছেন, তাঁর প্রতি পদক্ষেপে ছিল শাসকের রক্তচক্ষুর নজরদারি। কিন্তু সেই রক্তচক্ষুর ভয়ে ভীত না থেকে তিনি দেশের মানুষের মুক্তির জন্য দিনরাত কাজ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাঁর ঐক্যশক্তিকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। এই শক্তিই দেখাবে মুক্তির পথ। এ পথেই আসবে স্বাধীনতা। প্রতি পদক্ষেপে দুঃখ কষ্টময় জীবনকে বরণ করে তিনি সেই পথ নির্মাণ করেছেন। একটি জাতির পুরো জনগোষ্ঠীকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে আসা সহজ কাজ নয়। নিজের জীবনের সুখশান্তি, আরাম আয়েশ, পারিবারিক জীবনের নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার দিনযাপন- সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে সবাই পারেন না। যাঁরা পারেন, তাঁরাই মহামানব। যুগে যুগে তাঁরাই মানুষকে নানাভাবে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সেই মহান মানুষের কাতারে এক স্বর্ণপ্রভ নাম।

বঙ্গবন্ধুর মানবতাবাদী হৃদয় তাঁকে তরুণ বয়সেই মানব কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। বাংলার মানুষের ভাগ্য ফেরাবার জন্য তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন। মাত্র পঞ্চান্ন বছরের জীবনে তিনি প্রায় তের বছর জেল খেটেছেন। প্রতিবার তাঁকে জেলের নির্জন সেলে একাকী অবস্থায় দুঃসহ বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছে। স্ত্রী-পুত্রপরিজনের সাথে আনন্দময় প্রশান্তিপূর্ণ গৃহী জীবন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু তার জন্য তিনি কাতর ছিলেন না। অত্যাচার নিপীড়ন বন্দিত্ব সবকিছুকেই তিনি দেশের মানুষের মুক্তির মূল্য হিসেবে দেখেছেন। হাসিমুখে সহ্য করেছেন সমস্ত নির্যাতন। জেলের নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে অনেক কষ্টে সাধারণ এক্সারসাইজ বুক খাতার পাতায় সস্তা কলমে লেখা তাঁর রাজনৈতিক ও জেলজীবনের বয়ান যা ‘বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ নামে দুটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে দেখা যায় কত ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সততার মধ্য দিয়ে কী গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে জাতির নেতৃত্ব দিতে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন! বছরের পর বছর জেলের অন্ধকার কক্ষে বন্দি থেকেও

-২-

তিনি দেশের মানুষের কথাই ভেবেছেন। এমন কি জেলের বন্দিদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি অধিকার নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে দেনদরবার বাদানুবাদ করেছেন। কখনো নিজের সুবিধার কথা বলেননি। কারাগারের রোজনামচা বইয়ে দেখা যায়, লিখতে গিয়ে যখনই নিজের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তখনই তিনি জোর করে কলম থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘আমার কথা থাক’। নিজের খাবার জেলখানার ফালতু, বাবুর্চি, পাহারা, মালিদের সাথে ভাগ করে খেয়েছেন। এমন কি সামান্য চা-মুড়িও ওদের না দিয়ে তিনি একা খাননি। কোনো সেলে পরিচিত কারো জামাকাপড় আর বিছানার কষ্ট শুনে নিজের জামাকাপড় কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমন একজন মানবদরদী মানুষ বাংলার নেতা হয়েছিলেন বলেই তিনি শুধু রাজনৈতিকভাবে বাঙালি জাতির পিতা হননি, স্নেহমায়া-ভালোবাসার কারণেই তিনি ছিলেন প্রকৃত পিতা। বাংলার মানুষকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছিলেন। কোনো স্বার্থচিন্তা বা প্রলোভন তাঁকে টলাতে পারেনি। তাই সাতই মার্চের ভাষণে, যখন পুরো দেশ তাঁকে মানুষের ভাগ্যদেবতা বলে গ্রহণ করে নিয়েছে, তিনি বলতে পারেন, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি বাংলার মানুষের অধিকার চাই!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে হতভাগ্য বাঙালি আরও দুশো বছরেও স্বাধীনতা পেত কি না সন্দেহ। অথচ, আমরা কত বড়ো অকৃতজ্ঞ জাতি, আমাদের এই মুক্তির দূতকে আমরা স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় সবংশে হত্যা করে ফেলি! ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে যে কর্ণধার আমাদেরকে মুক্তির বন্দরে নিয়ে এলেন, নৌকা থেকে নেমেই আমরা তাঁকে গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলি! এদেশের মানুষের অকৃতজ্ঞতা আর হঠকারিতার সীমা নেই। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এসেই দ্রুত হাতে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতির অরাজক বিশৃঙ্খলাকে পুনর্বিন্যাস করে দেশকে গুছিয়ে তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এনে দেওয়া স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে একদল স্বার্থপর লালসালোলুপ অপমানুষ ছদ্মবেশে ভালো মানুষের মুখোশ এঁটে তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছুরি শানাতে লাগলো। বাংলার মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অগাধ বিশ্বাস, অবিচল আস্থা আর অন্ধ ভালোবাসা। তাই তিনি এসব চক্রান্ত দেখতে পান না, দেখেও মানতে চান না। তিনি ভাবতেও পারেন না, তাঁর শত্রু থাকতে পারে, তাঁর দেশপ্রেম, দেশ গড়ার কাজ, সমস্যা সংকট নিরসনের সংস্কার চিন্তাকে কেউ ভুল ভাবতে পারে! ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের ভোরের কালপ্রহরে যখন বঙ্গবন্ধুর বুক বরাবর তাঁর চেনা সেনাসদস্যরা বন্দুক তাক করেছিল, সদ্য ঘুম ভাঙা, হাতে পাইপ, বঙ্গবন্ধু চশমার ভেতর দিকে তাদের দিকে সেই অসীম বিশ্বাসের নেত্রপাত করে বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন, ‘তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?’ কিন্তু ঘাতকেরা তাঁকে আর কিছু বলার সুযোগ দেয়নি। ব্রাশ ফায়ার করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল তাঁর বুক। বত্রিশ নম্বর বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে তাঁর অসীম ভালোবাসা ভরা বুকের রক্তধারা নেমে এসেছিল রাজপথে। মিশে গিয়েছিল বঙ্গোপসাগরের জলে।

অতীতকাল থেকে বিশ্বে অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং, ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধিসহ অনেক নেতার কথা আমরা জানি, যাঁরা তাঁদের প্রগতিবাদী চেতনা ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য হিংস্র ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। মানুষের পৃথিবীতে কিছু অমানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বসবাস করে আসছে। মহামানবদের উদার নৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের স্বার্থে আঘাত করে। তখন হত্যার মধ্য দিয়ে তারা তার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু তার জন্য কখনও মহামানবের মহৎ কর্ম থেমে থাকে না। পরম মানবতাবাদী অহিংস অসাম্প্রদায়িক মহাত্মা গান্ধীকেও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি উগ্র হিন্দু মৌলবাদীদের হিংসার বলি হয়ে প্রাণ দিতে হয়। হত্যাকারী নাথুরাম গডসের গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে তিনি অসীম বিস্ময়ে শুধু দুটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন ‘হে রাম!’ স্বাধীন ভারতে তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে এ কথা যেন তিনি মৃত্যুর মুহূর্তেও বিশ্বাস করতে পারেননি! বঙ্গবন্ধুও ভাবতে পারেননি, স্বাধীন দেশের মাটিতে, তাঁকে সহচর সহকর্মীদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁরই অধীনস্ত সেনাসদস্যদের হাতে শিশুপুত্রসহ সপরিবারে প্রাণ দিতে হবে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে সবসময় কিছু মানুষ থেকে যায়, যাদের হাতে থাকে লোভ ও স্বার্থের শান দেওয়া ভয়াল কুঠার। ছায়াদায়ী, মায়াদায়ী, হাওয়াদায়ী, জীবনদায়ী মহাবৃক্ষকে সমূলে বিনাশ করতে তাদের এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। এই সমস্ত হিংস্র পশুদের সমাজ থেকে নির্মূল করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

১৫ আগস্টের কালপ্রহরে বাঙালি জাতির জীবনে বিধাতার এক চরম অভিশাপ নেমে এসেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময়ে জার্মানীতে অবস্থান করায় তা ছিল জাতির জন্য পরম আশীর্বাদ। পঁচাত্তরে মাতা-পিতা, ভাই-বোনসহ পরিবারের সবসদস্যকে হারিয়ে নিঃস্ব-রিক্ত তরুণী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসে শোকের মহাসমুদ্রকে বুকে বেঁধেও অসীম সাহসে পিতার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি হয়েছেন দেশের কাণ্ডারি। স্বার্থলোলুপ হিংস্র ঘাতকেরা ইনডেমনিটি বিল পাস করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। শেখ হাসিনা এর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে গেছেন। শোককে শক্তিতে পরিণত করে দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছেন, এই বাংলার মাটিতেই পঁচাত্তরের ঘাতকদের বিচার হবে। ফলস্বরূপ দীর্ঘ একুশ বছর পর ইনডেমনিটি বিল বাতিল হয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশেষে বঙ্গবন্ধু হত্যার পঁয়ত্রিশ বছর পরে ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি ৫ খুনির ফাঁসি কার্যকর করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের নৃশংসতম হত্যার বিচার সম্পন্ন করেন।

পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট যারা জাতির জনকের বুকে গুলি ছুঁড়ে হৃদপিণ্ড ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, তারা ঝাঁঝরা করেছিল স্বাধীনতার পতাকারই বুক। তারা জানে না, বঙ্গবন্ধুর হৃদপিণ্ডের প্রবল লাল রক্ত পতাকার কেন্দ্রমূলে জমাট বেঁধে থাকবে অনন্তকাল। জীবিত মুজিবের চেয়েও তাই নিহত মুজিব অনেক বেশি জীবন্ত। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থের দুই মলাটের নাম। একটি থাকলে আর একটিও অনিবার্যভাবেই থাকবে।

#

১৭.০৮.২০২০ পিআইডি নিবন্ধ